Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-X, Issue-III, April 2022, Page No.81-90
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

পুন:দর্শনে রাজা রামমোহন রায়

Ramesh Chandra Barman
Assistant Professor, Ghatal Rabindra Satabarsiki Mahavidyalaya, West Bengal

Abstract:

In Bengal, from the seventeenth century to the first half of the eighteenth century, there was a rampant catastrophe in the life of Bengalis in socio-economic, political and cultural life. The weakness of the central Mughal power led to the emergence of isolated regional powers on the one hand and foreign invasion on the other. The skeletal situation of trade and commerce have remained at that time, as a result, the economy to rely on self-governing rural economies. In Bengal, the religion of the priestly class, as the director of stratified Hindu society, was engulfed in filth - polygamy, child marriage, 'satidah'(a wife immolating herself on the funeral pyre of her dead husband). Education was degrading day to day, Sanskrit was the medium of instruction, which was a hindrance to the general education and the spiritual education system was of no use in practical life. In this context, women were transformed into objects of enjoyment and women were confined within the four walls of the house, deprived of all possible means of building individual freedom. As a result, Bengal was plunged into the darkness. Raja Rammohun Roy implemented the renaissance by combining the traditions and culture of the East with the good aspects of colonial rule through his thought, consciousness, and keen scholarly personality. I think the main purpose of the article is to highlight these aspects of Rammohun's ceaseless work and I think it will be relevant to his present 250th birth.

Key word: Bengali catastrophe, state power, skeleton, stratified, filthy, spiritual, calendar, individual-freedom, progressive and personality.

আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে
আসে নাই কেহ অবনীপরে -কামিনী রায়। [১]

সমাজে কিছু মানুষের আবির্ভাব ঘটে যাদেরকে গুনি, প্রতিভাধর বা সমাজ সংস্কারক ঠিক কোন অভিধা এদের জন্য প্রযোজ্য হবে তা নিয়ে সমাজতাত্ত্বিকগণ বা গবেষকগণ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েন, এদের কালোত্তীর্ণ চিন্তা ভাবনা এবং কর্ম সাধনার জন্য। এরূপ একজন মনীষী,কালোত্তীর্ণ ব্যক্তিত্ব হলেন রাজা রামমোহন রায়।উনবিংশ শতকে বাংলার নবজাগরণের কান্ডারী রামমোহন রায় মানুষকে 'ঈশ্বর সম্ জ্ঞান' করে মানুষের জন্যই সারা জীবন অক্লান্ত পরিশ্রম করে গেছেন এবং বাংলার নবজাগরণ কে সার্থক মহিমায় উন্নীত করেছেন। এজন্য তাকে 'ফাদার অফ মডার্ন ইন্ডিয়া' বলা হয়ে থাকে।[২] সপ্তদশ শতকের

দ্বিতীয়ার্ধ থেকে অষ্টাদশ শতক শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত বাংলার সার্বিক অক্ষয়ের চিহ্ন সর্বত্রই নগ্নভাবে প্রকটিত হয়েছিল। বাংলার এই অধোগতি থেকে নতুন ভাবে পথ চলা শুরু হয়েছিল অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে থেকে এবং উনবিংশ শতকের নবজাগরণ মাধ্যমে তা পূর্ণতা লাভ করে। অষ্টাদশ শতক জুড়ে বাঙালি জীবনের চূড়ান্ত অক্ষয় জনিত শূন্যতা থেকে নতুন করে বাঁচার জন্য যে হাহাকার,সেখান থেকেই অঙ্কুরোদগম হয় নতুন সম্ভাবনার বীজ। কবি অন্নদাশঙ্কর রায় বিষয়টিকে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন' যেখানে ছেদ নেই, ডিসকন্টিনিউটি নেই, সেখানে অন্ধকার থেকে আলোকে উত্তরণের প্রশ্ন উঠেনা'[৩] ধ্বংসের ভস্মরাশির মধ্যে ফিনিক্স পাখির মত ভবিষ্যতের সৃষ্টির সম্ভাবনার নিহিত ছিল এই সম্ভাবনাকে বাস্তব রূপ দিতে সর্বকালের সর্বযুগের একজন পথপ্রদর্শকের প্রয়োজন হয়। বাংলা তথা ভারতের সার্বিক অবনমন থেকে উত্তরণে যিনি এগিয়ে এসেছিলেন তিনি হলেন রাজা রামমোহন রায়।

এক

উপনিবেশিক উনবিংশ শতকে বাংলায় ধর্ম দর্শন সাহিত্য শিক্ষা বাঙালির সৃজনশীলতার বহিঃপ্রকাশ পরিলক্ষিত হয়েছিল, বাঙালির জীবনের এক সার্বিক সমৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়েছিল,ঐতিহাসিক,সমাজবিজ্ঞানীরা বাঙালির জীবনের এই অভূতপূর্ব পরিবর্তনকে নবজাগরণ বলে ভূষিত করেছেন.। এই নবজাগরণের একদিক ছিল অগ্রগতির অভিমুখে পদচারণা এবং এর বিপরীত দিক ছিল ভারতবর্ষের চিরন্তন সত্তাকে নতুন করে আবিষ্কারের সাধনা ।এই নবজাগরণের সার্থক রূপকার ছিলেন, কবিগুরুর ভাষায় 'সকাল বেলা সলতে পাকানো' কাজটি করেছিলেন রাজা রামমোহন রায়, যিনি বেদান্ত চর্চার প্রতিকৃত ছিলেন।[৪]তিনি পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও প্রাচ্যের সংস্কৃতির মেলবন্ধনের দ্বারাই এদেশে সামগ্রিক উন্নতি লক্ষ্য করেছিলেন। তাইতো কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ যেন তার মধ্যে লক্ষ্য করেছিলেন সমন্বয়ি ভাবাদর্শ "পশ্চিম আজি খুলিয়াছে দ্বার, সেথা হতে সবে আনে উপহার, দিবে আর নিবে, মিলালে মিলিবে, যাবে না নাকো ফিরে..."[৫] প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাবান হওয়া সত্ত্বেও রামমোহন রায় এ দেশের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলেছিলেন। শিক্ষা ছিল আধ্যাত্মিক ও সংস্কৃত নির্ভর, যা সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের বোধগম্য ছিল না।[৬] এর ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মানুষ এই শিক্ষাব্যবস্থার বাইরে প্রায় অবস্থান করছিল। অন্যদিকে আধ্যাত্মিক শিক্ষার ব্যবহারিক উপযোগিতা থাকায় মানুষ শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছিল। অন্যদিকে কোম্পানি সরকার বৃটেনের শিল্প বিপ্লবের তাড়নায় ব্রিটেনে উৎপাদিত পণ্য সামগ্রীর বাজার সৃষ্টি করার জন্য এবং দুর্বল কোম্পানি প্রশাসনিক কার্য পরিচালনার জন্য কেরানি পদে কিছু ইংরেজী জানা লোকের প্রয়োজন হয় । কোম্পানির এই উদ্যোগকে সি ই ট্রিভেলিয়ান মত পণ্ডিতেরা 'ইউটেলিটেরিয়ান তত্ত্ব' এর বাস্তব প্রয়োগ বলে অভিহিত করেন ।[৭] কোম্পানি সরকারের কৌশলগত প্রয়োজনীতার সঙ্গে এদেশে শিক্ষা - সংস্কৃতির উন্নতি একমাত্র বিকল্প পথ, কোথাও যেন এক জায়গায় এসে সম্মিলিত হয়েছিল। তবে যাই হোক না কেন বহু ভাষায় বিদগ্ধ পন্ডিত রাজা রামমোহনের কাছে ইংরেজদের মত আধুনিক উন্নত সভ্যতার ধারক বাহকদের ভারতে শাসন করা কে তিনি বিধাতার আশীর্বাদ বলে অভিহিত করেছেন।[৮]

পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি অনুরাগ ব্যক্ত করেছেন এবং তার বাস্তবায়িত করার চেষ্টা করছেন এই জন্য ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রণয়নে রামমোহনকে "the pioneer and promoter" বলে অভিহিত করেছেন রামানন্দ চ্যাটার্জী 'Rammohun Roy modern India' গ্রন্থে।[৯] বেন্থাম, নিউ রিকার্ডো, জেমস মিল ও জন স্টুয়ার্ট মিল প্রমূখ তৎকালীন ইউরোপের শ্রেষ্ঠ চিন্তাশীলদের রচনাবলী রাধামোহন প্রভাবিত হয়েছিলেন। 1822 খ্রিস্টাব্দে ইংরেজি ভাষায় পাশ্চাত্য জ্ঞান বিতরণের জন্য কলকাতার 'হেদুয়ায় অ্যাংলো হিন্দু

স্কুল' প্রতিষ্ঠা করেন। প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর এই বিদ্যালয়ে পড়েছেন। 1827 খ্রিস্টাব্দে মধ্যে ইস্কুলে 60 থেকে 80 জন হিন্দু বালক ইংরেজি ভাষা শিক্ষা লাভ করত।[১০] রামমোহন আলেকজান্ডার ডাফ কে কলকাতায় ইংরেজি স্কুল 'জেনারেল অ্যাসেম্বলি ইনস্টিটিউশন' স্থাপনায় সহায়তা করেছেন।[১১] বাংলা পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে অগ্রগতিতে অগ্রগতির মূল্যে যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটির নাম সর্বাগ্রে চলে আসে তা হল 'হিন্দু কলেজ'। হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে রামমোহনের নাম জড়িয়েছিল। আত্মীয় সভার সূত্র ধরেই ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনের বিদেশি অগ্রদূত ডেভিড হেয়ারের বন্ধুত্ব হয়। ডেভিড হেয়ার রামমোহনকে ইংরেজি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে প্রস্তাব দেন এবং তার বাস্তব রুপ দিতে হেয়ার কলকাতা সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি এডোয়ার্ড হাইট ইস্টের সঙ্গে আলোচনা করেন। কিন্তু তৎকালীন কলকাতার রক্ষণশীল হিন্দু নেতারা হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিতায় রামমোহনের উপস্থিতিকে তারা মানতে চায়নি।তাই রামমোহনের মত প্রকৃত শিক্ষা দরদি মানুষ এই কলেজের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করেন, কেননা সদস্য হয়ে নিস্ফল খ্যাতি ধরে রাখার থেকে তিনি স্বদেশবাসীর শিক্ষাকে অনেক বেশি মূল্য দিয়েছিলেন। হয়তো এই জন্যে অন্যদের কাছে বিষয়টি তীব্র পীড়াদায়ক হলেও তার কাছে অন্যান্য দু-চারটি সাধারণ ঘটনার মতোই ছিল। 1816 খ্রিস্টাব্দে 21সে মে হিন্দু কলেজে কমিটি গঠিত হয়, এতে আটজন ইউরোপীয় এবং কুড়িজন দেশীয় সদস্য কে নিয়ে এই কমিটি গঠিত হয় । শেষ পর্যন্ত 1817 খ্রিস্টাব্দে 20 শে জানুয়ারি গড়ান হাটায় গোরাচাঁদ বসাকের বাড়িতে হিন্দু কলেজের উদ্বোধন হয় ।[১২]

পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি তার আগ্রহ কতখানি ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় কোম্পানি রাজ কলকাতা সংস্কৃত কলেজ স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করলে রামমোহন সংস্কৃত পন্ডিত হওয়া সত্ত্বেও এই সিদ্ধান্তের প্রবল বিরোধী হন। শিক্ষা খাতে এক লক্ষ টাকা যথাযথভাবে ব্যয় করা হয় তার জন্য 1823 খ্রিস্টাব্দে 17 জুলাই কোম্পানি সরকার "General committee of public Instruction" রামমোহন কোম্পানি সরকারের শিক্ষা খাতে বরাদ্দের অর্থ যাতে কেবল 170 শিক্ষার জন্য ব্যয় করা হয় তার প্রবল দাবি জানিয়েছিলেন।তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষার পক্ষে সুদৃঢ় মতামত ব্যক্ত করেন অপর দিকে সংস্কৃত শিক্ষার বিপক্ষে একটি পত্র লেখেন লর্ড আমহার্স্টকে উদ্দেশ্য করে তবে 1823 খ্রিস্টাব্দে 11 ই ডিসেম্বর। পাশ্চাত্য শিক্ষার পক্ষে লেখেন "....We understood that the Government in England had ordered a considerable sum of money to be annually devoted to ……the natives of India in mathematics,.....And other useful sciences…,which the Nation of Europe have carried to a degree of perfection that has raised them above the inhabitants of the other parts of the world.." [১৩] .অন্যদিকে সংস্কৃত ভাষাশিক্ষার নেতিবাচক দিক গুলি উল্লেখ করে রামমোহন লিখেছেন " the Sanskrit system of education would be the best calculated to keep the country in darkness, if such had been the policy of British legislature" [১৪] যদিও সরকার রামমোহনের চিঠিপত্রের সদুত্তর না দিয়ে কলকাতায় সংস্কৃত কলেজ স্থাপনের সিদ্ধান্তে অটল থেকেছিলেন। কোম্পানি সরকার এবং নবগঠিত শিক্ষা পরিষদ হয়তো দুটি কারণে রামমোহনের চিঠির উত্তর দেয়নি। এক; হতে পারে রামমোহনের যুক্তির যথেষ্ট সারবত্তা ছিল;দুই, সরকার ভালোমতোই জানত যে তৎকালীন রক্ষণশীল তথা সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু সম্প্রদায়ের সঙ্গে রামমোহনের বনিবনার অভাব। ফলে তারা রামমোহনকে একপ্রকার অস্বীকার করেছিল।তবে যাইহোক,শিক্ষা দরদি ডেভিড হেয়ারের জমিতে 1824 খ্রিস্টাব্দের 25 শে ফেব্রুয়ারি কলেজ ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হল এবং ভিত্তিফলকে উৎকীর্ণ করা হয়েছিল, ' পরমসদাশয় মহামহিম চতুর্থ জর্জের

রাজত্বকালে,ভারতে ব্রিটিশ অধিকৃত অঞ্চল সমূহের গভর্নর জেনারেল মহামান্য উইলিয়াম পিট আমহার্স্ট এর আনুকূল্যে'[১৫] তবে রামমোহন রায়ের পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি ক্রমান্বয়ে চিৎকারে একেবারে ব্যর্থ হয়েছিল তা কিন্তু মনে করার কারণ নেই। একটি পরিসংখ্যান দিলেই বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যাবে, বাংলায় ইংরেজি শিক্ষার প্রতি যে ঝোঁক তা ক্রমান্বয়ে বেড়েই চলছিল।

পুস্তক বিতরণ ও বিক্রয় হিসাব

বৎসর	বাংলা	ইংরেজি
1822-23	11,704	893
1824-25	7326	755
1826-27	12654	4327
1828-29	10074	9616
1830-31	8281	11063[১৬]

তবে একথা সত্য যে এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসারে সরকারি উদ্যোগের অনেক পূর্ব থেকেই বেসরকারি উদ্যোগে বিশেষ করে মিশনারিরা তাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় পাশ্চাত্য শিক্ষা একটি স্বতন্ত্র ধারা প্রবাহিত হতে শুরু করেছিল। 1830 খ্রি. নিচের তথ্য থেকে ব্যাপ্টিস্ট মিশনারিদের শিক্ষার ধারা লক্ষনীয.

স্থান.....	ছাত্রসংখ্যা
শ্রীরামপুর	143 জন
ঢাকা	221 জন
চিটাগঞ্জ	129 জন
যশোর	12 জন
বেনারস	17 জন
এলাহাবাদ	6 জন
মোট	=528 জন

1831 খ্রিস্টাব্দে ব্যাপ্টিস্ট মিশন এর নিয়ন্ত্রণাধীনে পাঠরত ছাত্রী সংখ্যা ছিল,

স্থান	ছাত্রী সংখ্যা
শ্রীরামপুর	117 জন
ঢাকা	209 জন
চিটাগঞ্জ	129 জন
যশোর	6 জন
বেনারস	16
এলাহাবাদ	7 জন
মোট=	484 জন ।[১৭]

সামন্ততান্ত্রিক জমিদারি চেতনা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে রামমোহন ঔপনিবেশিক শাসনকালে শিক্ষাব্যবস্থাকে আধুনিকীকরণের নামে শ্রেণী স্বার্থকে চরিতার্থ করতে চেয়ে ছিলেন, এই বিষয়টিও ক্রমশ দিবালোকের মত পরিষ্কার হয়ে ওঠে। কোম্পানি সরকার শিক্ষাখাতের বরাদ্দকৃত অর্থ পাশ্চাত্য না প্রাচ্য কোন খাতে ব্যয় করা হবে এই বিতর্কে রামমোহন পাশ্চাত্যের পক্ষ অবলম্বন গ্রহণ করেছিলেন, অর্থাৎ আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত

শিক্ষাব্যবস্থা ,এই বিষয়টি না হয় সমর্থনযোগ্য হল। জ্ঞান প্রদানের মাধ্যম কি হবে সেই বিষয়টি যখন প্রশ্ন ওঠে তখনো তিনি মাতৃভাষায় সমর্থন জানান নি, অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়েছিলেন ইংরেজি ভাষাকেই। অথচ সেই সময় প্রখ্যাত শিক্ষাবিদেরা যেমন মার্শমান, কেরি,ডিরোজিওর মত ব্যক্তিত্বরা চেয়ে ছিলেন মাতৃভাষায় আধুনিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা। এরা স্বদেশী জানলা দিয়ে পাশ্চাত্য জ্ঞানকে আরোহণের কথা জোর দিয়েছিল। এইজন্য বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় গ্রন্থ গুলি এবং বিভিন্ন শাখায় খ্যাতনামা বিদেশিদের এনে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা কথা বলেছিল। তাই বলা যেতে পারে যে রাজা রামমোহন রায় কোথাও যেন শিক্ষার মাধ্যমকে নিয়ে আগে থেকেই দায়বদ্ধ ছিলেন।

দুই

ধর্মানুষ্ঠান বলতে প্রথাগত আচারসর্বস্ব ধর্মীয় ক্রিয়া-কলাপ বা ঈশ্বর আরাধনা নয়, ধারণ করার অনুষ্ঠান।মানুষের বিদ্যাবুদ্ধি সহ যা জীবনকে পরিশীলিত,উন্নত করার কৌশল গুলি সে সমাজ থেকে আরোহন করে। সমাজ ব্যতিরেকে তার অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না।

> ‘ধর্মানুষ্ঠানে প্রধানত ক্ষেত্রের নাম সমাজ।
> যেখানে কতগুলি নর-নারী পরস্পরের মুখাপেক্ষী হয়ে বসবাস করেন,
> সেখানেই সমাজ গঠিত হয়‘….. . হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। [১৮]

এর দ্বারা সাহিত্যরত্ন হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ধর্মানুষ্ঠান বলতে প্রথাগত,আচারসর্বস্ব ধর্মীয় ক্রিয়া-কলাপ নস্যাৎ করে ধারণ করার অনুষ্ঠান, অর্থাৎ বিশেষ এক ভাষা গোষ্ঠীর মানুষ নিজেদের রীতিনীতিকে ধারণ করে সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশ ঘটায় সমাজের মাধ্যমে। তাইতো বলা যায় ধর্ম হল প্রাণবান ও সজীব বিষয়,যা চলার পথে জীবনকে সঠিক মার্ক দর্শন কড়ায়।প্রসঙ্গত:উল্লেখ্য যে মহাভারতের নায়ক শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে উপস্থিত হয় যোদ্ধা মনোবৃত্তি ফিরিয়ে আনতে অর্জুনকে যে ধর্মের ব্যাখ্যা প্রদান করেছিলেন। এছাড়া সংস্কার হয়ে ওঠে জীবনের চার্জার বা আচরণের বিষয়। যার মধ্য দিয়ে আত্মা শুদ্ধি পবিত্রতা ও জাগরন ঘটায়।সমাজ প্রতিফলিত হয় লিখিত রূপ- শাস্ত্রীয় বিধান এবং সর্বাধিক মানুষের মঙ্গলের জন্য পরম্পরা বা প্রথা এর দ্বারা, যা অলিখিত।[১৯] প্রাচীন ভারতের সমাজ বিন্যাস চতুর্বর্ণ প্রথার ধর্ম সংঘাত ও সংকটের মধ্যদিয়ে অষ্টাদশ শতকে বাঙালি সমাজ শতাব্দী প্রাচীন প্রথা রীতিনীতি ও অন্ধ সংস্কারে আবদ্ধ করে ফেলে। হিন্দু ধর্মের জাতিভেদ প্রথা হিন্দু সমাজের ‘Healthy growth’ কে প্রতিহত করেছে এর ক্ষতিকারক প্রভাব পড়েছে আধ্যাত্মিক ও বাস্তব জীবনে। হিন্দু ধর্মে এতটাই স্তরীভূত হয়েছিল যে এক শ্রেণী অন্য শ্রেণীকে বহিরাগত মনে করে। জাতিভেদ প্রথা কতখানি কঠোর ও অনমনীয় ছিল তা উল্লেখ করেছেন রিজলে, তিনি লিখেছিলেন "The strata,indeed, remain or multiplaied, their relative position are, on the whole, unaltered’ [২০] বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ, শিশু সন্তান হত্যা সমাজের আষ্টেপৃষ্ঠে গেছে যায় সংকীর্ণ অন্তর্দ্বন্দ্ব পরনিন্দা,পরচর্চার মত বিষয়গুলি প্রাধান্য পায়.।কিন্তু উনবিংশ শতকে ধর্মের সমস্ত ভালো গুণগুলি যেন কালের হওয়ায় বিদায় নিয়েছিল।

ঔপনিবেশিক সরকারের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা লক্ষ্য করেছিলেন ভারতীয়দের দৈনন্দিন জীবনের সমস্ত কিছুই পরিচালিত হয়েছিল ধর্মের দ্বারা। জাতপাত যেন তীব্র রক্ষনশীলতার মোড়কে আবদ্ধ ছিল। সমাজের বৃহত্তর সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ, নিম্নবর্ণের মানুষ ও মহিলারা যেন ব্রাহ্মণ্য সমাজ ব্যবস্থার বাইরে অবস্থান করছিল।[২১] ধর্মের বেরাজাল এতটাই তীব্র ছিল যে ধর্মীয় গণ্ডির বাইরে খাওয়া-দাওয়ার কথা চিন্তা ভাবনার বাইরে ছিল। জাতপাতের প্রকোপ কতটা গভীর ছিল তা অনুমান করা যায়, বালক রামতনু লাহিড়ী যখন

হেয়ার সাহেবের বিদ্যালয়ে অবৈতনিক শিক্ষার্থী হিসেবে অংশগ্রহণের প্রচেষ্টার সময়। বালক রামতনু লাহিড়ী অভুক্ত অবস্থায় থাকা সত্বেও যখন হেয়ার সাহেব তাকে খাবারের প্রস্তাব দিয়েছিল, তখন ছোট্ট রামতনু বিদেশি ও বিধর্মী লোকের খাবার খেলে 'জাত যাবে' এই ভয়ে সে মিথ্যা কথা বলেছিল,যে সে খাবার খেয়েছে।[২২] প্রত্যেকটি মানুষ ধর্মের দাস এ রূপান্তরিত হয়েছিল,ধূর্ত ও সুচতুর ব্রাহ্মণদের দ্বারা। এরা সাধারণ মানুষের জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপকে পঞ্জিকার বাধা নিষেধ ও চণ্ডীমণ্ডপের অবাঞ্চিত অঙ্গুলিহেলনে দ্বারা ধর্মকে পরিচালিত করেছিল। ধর্মকে তারা ব্যবহার করে তাদের জীবনকে সুখকর ও আরামপ্রদ করে তুলেছিল, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষকে ধর্মের এই জুজু দেখিয়ে।এই প্রসঙ্গে William Ward লিখেছেন " ... the revolutions of the heavenly bodies … the superstitious fears of the people… births, sickness, marriages, misfortunes, deaths… a future state… every form and ceremony of religion …. all the public festivals etc. etc. have been seized upon as sources of revenue to the Brahmuns"[২৩] হিন্দু ধর্মের বহু দেবতার পূজা অর্চনার নিত্যনৈমিত্তিক বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

হিন্দু ধর্মের ব্রাহ্মণ্য প্রভুত্ব এবং বহুত্ববাদের অসারতা উপলব্ধি করেছিলেন বহু ভাষার অসামান্য পাণ্ডিত্যের অধিকারী রামমোহন। তিনি লিখেছিলেন "....The peculiar practice of Hindoo idolatry which, more than of any other pagan worship, destroy the texture of society, together with compassion for my countrymen" [২৪] রামমোহন পাটনা থেকে পার্সি -আরবি ভাষায় যথেষ্ট পান্ডিত্য অর্জন করেন। কাশীধামের সংস্কৃত ভাষা রক্ত করেন এবং ইংরেজিতে মুন্সিয়ানা দেখিয়েছেন তার প্রমান পাওয়া যায় 1821 খ্রিস্টাব্দে লর্ড আমহার্স্ট এর নিকট সংবাদপত্রের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য চিটি থেকে । তাছাড়া রামমোহন হিন্দু ধর্মের প্রামাণিক গ্রন্থ গুলি যেমন বেদ, উপনিষদ ও পুরাণ প্রভৃতি বিষয়ে অসাধারণ পান্ডিত্য অর্জন করেছিলেন। তৎকালীন হিন্দু সমাজ ধর্মের মৌলিক বিষয়গুলি যেমন, বেদের কর্মকাণ্ড ও উপনিষদের ব্রহ্মজ্ঞান স্মৃতির তালিকায় অবগুণ্ঠিত রেখে, দুর্গাপূজায় বলিদান, তীর্থযাত্রা, গঙ্গা স্নানের মত বাহ্যিক বিষয়গুলি নিয়ে মেতে ওঠে। রামমোহন পুত্তলিকথা ও বহুত্ববাদের অসারতা উপলব্ধি করে অনুগতদের নিয়ে, এদের মধ্যে অনেকে কলকাতার নয়া জমিদার শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, 1815 খ্রিস্টাব্দে আত্মীয় সভা প্রতিষ্ঠা করেন। এই উদীয়মান শ্রেণীর মানুষেরা ছিলেন প্রসন্নকুমার ঠাকুর, দর্পনারায়ন ঠাকুর, গোপীমোহন ঠাকুর ,তেলিপাড়ার জমিদার অন্নদা প্রসাদ বন্দোপাধ্যায়, প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর, টাকির জমিদার কালিনাথ রায়,খিদিরপুরের ভূকৈলাশ, রাজা কালি শংকর ঘোষাল,আন্দুলের জমিদার কাশীনাথ মল্লিক, রাজচন্দ্র রায় ও নন্দকিশোর বসু প্রমুখ।[২৫] আত্মীয় সভা কে বেদান্ত ধর্মের ব্যাখ্যা ও বিচার হতো এছাড়াও বহুবিবাহ বাল্যবিবাহের মতো বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হতো এবং প্রত্যেক সদ্য স্বাধীন মত প্রকাশের সুযোগ ছিল। রামমোহন আত্মীয় সভা কে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন মূলত তৎকালীন হিন্দুধর্মের সংকট থেকে পরিত্রাণের উপায় হিসাবে। কেননা ওই সময় হিন্দু ধর্মের দুর্বলতার সুযোগে খ্রিস্টধর্মের আধিপত্যবাদ হিন্দুধর্মকে সংকটের মুখোমুখি দাঁড় করায় অন্যদিকে এই সঙ্কটের মূল কারণ ছিল এই ধর্মের অনাচার ব্যভিচার ও বিশৃঙ্খলা।রামমোহন রায়ের আত্মীয় সভার জনপ্রিয়তায় চির ধরানোর জন্য হিন্দু ধর্মের গোরা রক্ষণশীলদের সঙ্গে মাঝেমধ্যেই রামমোহনকে তর্কযুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে হতো।গোরা রক্ষণশীল দলের নেতৃত্ব স্থানীয়রা হলেন;যেমন রাধাকান্ত দেব .রামমোহন রায় তার কৌমুদী সংবাদপত্রে

সতীদাহ বিপক্ষে নিরলস প্রচার চালিয়ে গিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত ঔপনিবেশিক সরকারের বদান্যতায় এই নিষ্ঠুর প্রথা বন্ধ করা সম্ভব হয়েছিল।

তিন

সতী যার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হলো সৎ, এর দ্বারা সত্য ,সুন্দর এবং নৈতিক গুণাবলী সম্পন্ন নারীকে বোঝায়। সদ্যমৃত স্বামীর জ্বলন্ত চিতায় পুণ্য লাভের বাসনায় ও পরলোকেও সমীর নিত্য সহচর্যে থাকার বাসনায় বিধবা নারী নিজের জীবন উৎসর্গ করাকেই sati। যদিও সতি হওয়ার বিষয়টি সব সময় স্ব-ইচ্ছায় হয়না প্রায়ই জোর করে তার জীবনকে উৎসর্গ করা হত। সাধারণভাবে মনে করা হয়েছে বাস্তব জগতের একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি(পুরুষ), মারা গেলে তার নিত্য সহযোগী, অনুগামীরা বিশেষ করে তার স্ত্রী সেবা যত্নের জন্য সহমরণ এ অংশগ্রহণ করতেন।[২৬] তবে H.H Wilson তার 'miscellaneous Essays and Lectures'এবং P.v Kane, তার হিস্ট্রি অফ ধর্মশাস্ত্র গ্রন্থে বলেছেন যে বৈদিক যুগে সতির কোন ঘটনা নেই,তাই বলা যায় যে নারীদের সতী হওয়ার ঘটনাটি পরবর্তীকালের এবং এটাও ঠিক যে মহাকাব্যিক যুগে এই বিষয়টি সংক্ষিপ্ত আকারে রাজ ঘরানার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। সতী হওয়ার বিষয়টিকে দুই ভাগে ভাগ করা হয় 'সহগমন' অর্থাৎ সদ্য মৃত স্বামীর জ্বলন্ত চিতায় সদ্য বিধবার আত্মাহুতি প্রদান এবং 'অনুমরন' অর্থাৎ স্বামীর মৃত্যুর পর বিধবা পুন্য সঞ্চয় এর জন্য আত্মাহুতি প্রদান করা।

উপনিবেশিক শাসনের প্রাক্কালে 1743 খ্রিস্টাব্দে ইংলিশ কুটির অধ্যক্ষ স্যার ফ্রান্সিস রাসেল এবং হলওয়েল স্বচক্ষে সতীদাহ হতে দেখেছিলে। উপনিবেশিক বাংলায় উনবিংশ শতকের প্রথম ও দ্বিতীয় দশকের সতী হওয়ার ঘটনা প্রায় লক্ষ্য করা গিয়েছিল। 1799 খ্রিস্টাব্দের নদীয়ার এক কুলীন ব্রাহ্মণের 2 2 জন স্ত্রী তার সঙ্গে সহমৃতা হয়, 1804 খ্রিস্টাব্দে কলকাতার চতুর্দিকে 30 মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত সীমানার মধ্যে প্রায় তিনশত বিধবা সহমৃতা হয়েছিল।[২৭] কোম্পানির শাসনের প্রথম পর্বে কোম্পানির ভারতের অভ্যন্তরীণ সমাজব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ না করাতেই উৎসাহী ছিল। ফলে ভারতের হিন্দু ধর্ম ও সমাজের এই অমানবিক প্রথা সম্বন্ধে সব কিছু দেখার পরও না দেখার ভান করে চুপ থেকে ছিল ঔপনিবেশিক সরকার। তবে কোম্পানির উচ্চপদস্থ আমলারা যে এ বিষয়ে একেবারে চুপ ছিলে না তা বোঝা যায়। 1797 খ্রিস্টাব্দে মেদিনীপুরের ম্যাজিস্ট্রেট সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে আইন প্রণয়ন করা যায় কিনা সেই বিষয়ে গভর্নর কে চিঠি লিখেছিলেন।[২৮] অন্যদিকে 1815 খ্রিষ্টাব্দের বুন্দেলখন্ড ম্যাজিস্ট্রেট এ বিষয়ে পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য ভারত সরকারের কাছে অনুরোধ করেন। 1817 খ্রিস্টাব্দে ভারত সরকার এই মর্মে আইন প্রণয়ন করেন যে সদ্য বিধবা নারী সহগামী হতে গেলে আগে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমতি নিতে হবে। আরো এক ধাপ এগিয়ে লর্ড আমহার্স্ট সতীদাহ প্রবণতা কমাতে কিছু নির্দেশ জারি করেছিলেন;- সতী হতে আগ্রহী নারীকে নিজে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে হাজির থেকে অনুমতি পত্র নিতে হবে, সতীর সহমরণে সহায়তাকারী কোন ব্যক্তি সরকারি চাকরি পাবে না এবং সহমৃতা বিধবার সম্পত্তি সরকার বাজেয়াপ্ত করবে।

উনবিংশ শতকে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব বাংলার সমাজে একশ্রেণীর নারীর আবির্ভাব ঘটে, যারা পুরুষতান্ত্রিক সমাজের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সতীদাহ প্রথা মানে নি, এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে রাজা রামমোহন রায়ের মাতা তারিণী দেবী, এবং উনবিংশ শতকের নতুন মহিলা ডক্টর বিনা মজুমদার, মজুমদারের ঠাকুরমা তাদের পরিবারের হয়ে শেষ সতী হয়েছিলেন, এরপর আর তাদের পরিবারের এই ঘটনা ঘটেনি বা হয়নি এর থেকেই বুঝতে অসুবিধা হয় না যে সতী হওয়ার বিষয়টি অগ্রসর পরিবারের নারীরা এই কথাটি কি দূরে

সরিয়ে রেখেছিল।[২৯] অন্যদিকে ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার মুসলমান সমাজের নারী মুক্তির অগ্রদূত রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন 'স্ত্রীজাতির অবনতি' প্রবন্ধের পাশ্চাত্য সভ্যতার অগ্রগতি এবং এশিয়ার অবনতি প্রসঙ্গে আক্ষেপের সুরে বলেছিলেন-'.....ঈশ্বর কি কেবলই এশিয়ারই? আমেরিকায় তার রাজত্ব ছিল না?.....যেখানে ধর্মের বন্ধন অতিশয় দৃঢ়, সেইখানে নারীর প্রতি অত্যাচার অধিক....' [৩০]

'নবজাগরণের অগ্রদূত'ও 'ভারতের আধুনিক মানুষ' রাজা রামমোহন হিন্দু ধর্মের বর্বোরোচিত ও নিষ্ঠুর বললেও কম বলা হয় , সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদ করতে বদ্ধপরিকর হন। নারী-জীবনের এই দুর্বিষহ প্রথাটির প্রতিকার কল্পে তিনি এবং তার প্রগতিশীল অনুগামীদের স্বাক্ষরিত আবেদন পত্র গভর্নর জেনারেল ছিলেন উইলিয়াম বেন্টিংক কাছে পাঠান 1828 খ্রি,। রামমোহন সত্যি প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেন এমনকি শশান ঘাটে গিয়েও সহমরণার্থী বিধবাকে নিভৃত হতে সাহায্য করেছিলেন। 1818 খ্রিস্টাব্দে সহমরণ বিষয়ক 'প্রবর্তক ও নিবতকের সম্বাদ' গ্রন্থের প্রমাণ দেন বিধবাদের সহমরণ, এরূপ কোন নির্দেশ কোন হিন্দু শাস্ত্রে নেই। যাই হোক শেষপর্যন্ত রামমোহনের আবেদনে সাড়া দিয়ে ভারত প্রেমী লর্ড বেন্টিঙ্ক 1829 খ্রিস্টাব্দে আইন পাশ করে সতীদাহ প্রথা রদ করেন। যদিও প্রাথমিক দিকে সতীদাহের বিরুদ্ধে আইন প্রণয়নের বিষয়টিকে আপত্তি জানিয়েছিলেন রামমোহন রায় তার, যুক্তি ছিল আইনের দ্বারা সামাজিক সমস্যার সমাধান সম্ভব নয় বলে।

চার

"A well informed citizenry is the foundation of our democracy,
then the newspaper must be saved".....Thomas Jefferson

গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ হল দেশের সংবাদপত্র,সংবাদপত্রের স্বকীয়তা ও স্বাধীনতা যাই বলি না কেন, তা সুরক্ষিত থাকে জানগনের সচেতনতার উপর। উপনেবেশিক সরকার বানিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা পরিচালিত। এর ফলে সরকারের জন জনকল্যাণের মত মূল বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দেওয়া দরকার তা প্রায়ই কোম্পানি সরকার অবহেলা করে যেত।এখানে জনগণের অতন্দ্র প্রহরী হিসাবে সংবাদপত্র গুলি সরকারের ভালো মন্দ দিকগুলি তুলে ধরত আর এটি ছিল সরকারের না পছন্দ। তাই ভারতবর্ষের প্রথম সংবাদপত্র জেমস অগাস্টাস হিকি বেঙ্গল গেজেট সরকারের রোষানলে পড়ে, এরপর থেকে সংবাদপত্রে বিরুদ্ধে সরকারের রক্তচক্ষুর তালিকা ক্রমশ দীর্ঘায়িত হতে থাকে।[৩১]

আধুনিক ভারতের অগ্রদূত রাজা রামমোহন রায়কে 'Father of liberalism' ও বলা হয়ে থাকে ।তার চিন্তাভাবনা সমাজের মধ্যে সম্প্রসারিত করতে সংবাদপত্রকে হাতিয়ার হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। তিনি ইংরেজিতে ব্রহ্মনিক্যাল ম্যাগাজিন ,1821 খ্রিস্টাব্দে বাংলায় সংবাদ কৌমুদী এবং 1822 খ্রিস্টাব্দের সাপ্তাহিক পার্সিতে মিরাদ-উল- আকবর, প্রচারের মাধ্যমে তৎকালীন সমাজের অবস্থা রাজনৈতিক বিষয় এর মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো তুলে ধরেন। তিনি উদারনৈতিক ও যুক্তিবাদী মানুষ হিসাবে নাগরিক সচেতনতা বোধ তারমধ্যে প্রখর ছিল । 1823খ্রিস্টাব্দে 14ই মার্চ, লর্ড অ্যাডাম Press Ordinance দ্বারা সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করার চেষ্টা করলে রামমোহন রায় এই আইনের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ আন্দোলন গড়ে তোলেন। [৩২] রামমোহন ও পাঁচজন বিশিষ্ট অনুগামীকে নিয়ে, যেমন- চন্দ্রকুমার ঠাকুর, দ্বারকানাথ ঠাকুর, হরচন্দ্র ঘোষ, গৌড়ি চরণ ব্যানার্জি ও প্রসন্নকুমার ঠাকুর সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করেন। তিনি আবেদনপত্রে লিখেছিলেন "Every good ruler will be anxious to afford every individual the readiest means of bringing to his notice whatever may require his interference. To secure this important

object, the unrestricted liberty of publication is the only effectual means that can be employed,'যা তার গণতান্ত্রিকতা, নাগরিক সচেতনতাবোধ,সম্বন্ধে প্রত্যেকটি ছত্রে ছত্রে প্রতিফলিত হয়েছিল । যদিও তারা আন্দোলনের সত্ত্বেও সরকার এই আইনের কোনো পুনঃবিবেচনা করেনি কিন্তু রামমোহনের যুক্তিপূর্ণ ও ওজস্বিনী ভাষায় প্রতিবাদ পরবর্তী প্রজন্মকে সরকারবিরোধী আন্দোলনের পরিচালনা করতে সাহায্য করেছিল। কোম্পানি রাজ্যের বিরুদ্ধে সৎ সাহসের সঙ্গে মাথা তুলে দাঁড়ার ঘটনা শুধু ভারতবাসী স্বার্থে নয়,স্বাধীনভাবে জ্ঞান অর্জন করার যে মানুষের জন্মগত অধিকার আছে, তার প্রতিস্থা তিনি সেদিন করে গিয়েছিলেন। এ কারণেই তিনি ভারতবাসীর কাছে 'প্রথম আধুনিক মানুষ', 'জাতীয়তাবাদের অগ্রদূত' ইত্যাদি নামে আখ্যায়িত হয়েছেন। এখানেই রাজা রামমোহনের প্রাসঙ্গিকতা আজও অপরিবর্তিত রয়েছে ।শুধু তাই নয় রাজা রামমোহন এতটাই গণতান্ত্রিকতা সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে প্রশাসনের বিকেন্দ্রীকরণ এবং প্রশাসন থেকে আইন বিভাগের পৃথকীকরণের কথা বলেছিলেন। অন্যদিকে বিশ্ব মানবতাবাদের দ্বারা উদ্বুদ্ধ ছিলেন তাইতো তিনি ফ্রান্সের আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়েছিলেন।

তথ্যসূত্র:

১.কামিনী রায়, (কাবিতা) সকলের তরে সকলে আমরা,

২. অধ্যাপক নরহরি কবিরাজ, সাম্পাদিত (1984), উনিশ শতকের বাংলার জাগরণ: তর্ক বিতর্ক কে,পি,বাগচী এন্ড কোং, পৃষ্ঠা 162 থেকে 164।

৩. দিতি রায়, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা :কাল থেকে কালান্তরে, আশাদীপ,থেকে সংগৃহীত , পৃষ্ঠা 16

৪. হাবিব আর রহমান,বাঙালি মুসলমান সমাজে প্রগতিশীলতা ও রক্ষনশীলতার দ্বন্দ্ব, কথাপ্রকাশ পাবলিকেশন পৃষ্ঠা 16-25।

৫.রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভারততীর্থ (কবিতা)

৬। প্যারীচাঁদ মিত্র , ডেভিড হেয়ার, বাঙ্গানুবাদ- ব্রজদুলাল রায়, p 13

৭. শেখর বন্দোপাধ্যায় ,পলাশী থেকে পার্টিশন,(আনুবাদ- কৃষ্ণেন্দু রায়), ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসয়ান পৃষ্ঠা- 86, 87,

৮. রাজা রামমোহন ও তৎকালীন বঙ্গদেশ এর অর্থনীতি ও সংস্কৃতি পৃষ্ঠা,88, কৃষ্ণ কৃপালিনী, দারোকা নাথ ঠাকুর বিস্মৃত পথিকৃৎ, এর থেকে নেওয়া হয়েছে পৃষ্ঠা 217।

৯. Profulla Kr Das, the role of Brahmo Samaj in freedom movement of India from Rammohun Ray to Shibnath Shastri, p-68

১০. ঋষি দাস, রাজা রামমোহন, পৃষ্ঠা 124।

১১. তদেব, পৃষ্ঠা-127

১২. ডেভিড হেয়ার পৃষ্ঠা 6, 7 & রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বাংলাদেশের সমাজ পৃষ্ঠা 78, 79 রামমোহন ও তৎকালীন বঙ্গদেশ এর অর্থনীতি ও সংস্কৃতি পৃষ্ঠা 96 97 ।

১৩. গোপাল চন্দ্র সরকার,বঙ্গদেশে বর্তমান শিক্ষা বিস্তার, স্টুডেন্ট লাইব্রেরি কলকাতা p-6.

১৪. দিতি রায়, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা :কাল থেকে কালান্তরে, আশাদীপ,থেকে সংগৃহীত , পৃষ্ঠা 2 3

১৫.প্যারীচাঁদ মিত্র , ডেভিড হেয়ার, অনুবাদ- ব্রজদুলাল রায়, p-16 ,17

১৬. অমলেন্দু দে, বাঙালি বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ পৃষ্ঠা - 62.

১৭.Sources, periodical account of the Srirampur misson,1831,পৃষ্ঠা 65 এবং 75.

১৮. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, গৌর বঙ্গ সংস্কৃতি পুস্তক বিপণি1999 পৃষ্ঠা 65. তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কাল থেকে কালান্তরে দিতি রায় 127।

১৯.তদেব, পৃষ্ঠা - 127-28।

২০. .H.H. Risley:People of India, p-217

২১. Tanika Sarkar, Hindu wife Hindu Nation,p-97 ।

২২. রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ পৃষ্ঠা 46, 47 ।

২৩. William Ward,Accounts of the Writings,Religion and Manners of Hindoos,vol-IV, p-20.

২৪.Prafulla Kumar Das: The role of the Brahmo Samaj in the freedom movement of India from Raja Rammohun Roy to Sivanath Sastri 1772 to 1919।

২৫. ডক্টর কুমুদ কুমার ভট্টাচার্য,রাজা রামমোহন: বাংলাদেশের অর্থনীতি ও সংস্কৃতি, পৃষ্ঠা 69।

২৬. Schradar, Aryan Religion, Encyclopedia on Religion and Ethics,vol-II,p 11 -57

২৭. রমেশচন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস, তৃতীয় খন্ড পৃষ্ঠা, 339 40 41 ।

২৮. তদেব, পৃষ্ঠা-340 ।

২৯. Geraldine Forbes,Women in Modern India, Cambridge University press,p-11,12।

৩০. হাবিব আর রহমান,বাঙালি মুসলমান সমাজে প্রগতিশীলতা ও রক্ষনশীলতার দ্বন্দ্ব, কথাপ্রকাশ পাবলিকেশন, পৃষ্ঠা 22 থেকে 23।

৩১. Dr. Chandrakanta K Mathur,Media in India Raj to Swaraj,p-45, এবং রমেশচন্দ্র মজুমদার বাংলাদেশের ইতিহাস তৃতীয় খন্ড পৃষ্ঠা 454 55।

৩২. রমেশচন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস্,তৃতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা- 472-73।